Issue cover not available

Vol. 12 | No. 1 | 1968

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়

Volume	12
Issue	1
Year	1968
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবদুল মওদুদ
Published online	June 15, 1968
DOI	10.62328/sp.v12i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v12i1.8
Pages	257-275
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

**নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায় ঃ সৈয়দ আলী আশরাফ সম্পাদিত।
প্রকাশক ঃ বাংলা সাহিত্য বিভাগ, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়। পৃষ্ঠা ৭৮। মূল্য ছয় টাকা।**

বেশ কিছুদিন পূর্বে শ্রদ্ধেয় আবুল ফজল 'নজরুল-জীবনীর উপকরণ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন ঃ "তিনি জিতেন্দ্রিয় ছিলেন না, বরং পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দাস ছিলেন বলতে পারি। ভালবেসেছেন প্রাণ ঢেলে, ভালবাসা পেয়েছেনও অপর্যাপ্ত। প্রেমে পড়েছেন, প্রেমে না পড়েও প্রেম করেছেন। প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, প্রত্যাখ্যানও করেছেন, বিরহের অনলে নিজে পুড়েছেন অন্যকেও পুড়িয়েছেন। এমন কি তাঁর জন্য আত্মহত্যাও করেছেন নারী।…

শুনেছি কবির প্রথমা প্রিয়াও বেঁচে আছেন—ইতিহাসের খাতিরে নজরুলের সঠিক জীবনী রচনা ও মানুষ হিসেবে তাঁর পরিচয়লাভের সুবিধার জন্য ইনিও অসংকোচে অকুণ্ঠিতভাবে নজরুলের প্রথম যৌবনের পাগলামী ও দায়িত্বহীনতার অনেক খবরই হয়ত দিতে পারবেন। এক অজ্ঞাতনামা পল্লী কিশোরীর চটুল ও ভীরু চাহনি, অপাঙ্গের দুই পুষ্প-শায়ক অত বড় দুর্দান্ত সৈনিক হৃদয়কেও জখম করে ছেড়েছিল, বায়োগ্রাফারের জন্য এর থেকে লোভনীয় খবর আর কি হতে পারে?"[১]

এ প্রবন্ধ পাঠ করে আশান্বিত হয়েছিলেম যে, অতঃপর কবি নজরুল ইসলামের প্রেম-কাহিনীর ঝাঁপি উন্মোচিত হবে, এবং তার ফলে তাঁর বহু কবিতা ও গানের জন্মকাহিনী বা পটভূমিকাও বিবৃত ও উদঘাটিত হবে। তাঁর অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক মহলে এ-সম্বন্ধে বহু কানাকানি, হাস্যবিদ্রূপ চলতো। কিন্তু কেউ-ই এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কলম ধরেননি। তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য প্রেম-ভিখারিনীদের বা তাঁদের পক্ষেও কেউ এ পর্যন্ত লেখনীমুখে কোনও তথ্য লিপিবদ্ধ করেন নি।

এই নীরবতার কারণ নির্দেশ করা অসম্ভব নয়। এ দেশে কবি-সাহিত্যিক ও ধর্মীয়-রাজনীতিক নেতৃত্বে যাঁরা শীর্ষস্থান অধিকার করেন, তাঁদের শেষ পর্যন্ত 'গুরুদেব' 'মহাত্মা' 'জী' বা 'হযরতে' 'হুজুরে' রূপান্তরিত হতে হয়। তার দরুণ আসল মানুষটির পরিচয় ঢেকে ফেলা হয়—পাপে-পুণ্যে, দোষে-গুণে, রক্তমাংসের আটপৌরে মানুষটির জীবনী লিখিত হয় না, পরিচয়ও মেলে না। তার ফল এই যে, অন্ধভক্তির চোটে ভক্তিভাজন মানুষটির চরিত্র ও প্রতিভা বিকাশের ক্রমিক স্তরটি অনুসন্ধিৎসু মনের নিকট অজ্ঞাত রয়ে যায়।

কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের স্বভাবতই কৌতূহল জন্মে; কারণ তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও বিশেষ-বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মের পরিচয় ও মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়। আবার যদি এ ব্যাপারে প্রেমের সম্পর্ক থাকে, তাহলে এ কৌতূহল শতগুণে বর্ধিত হয়, বরণীয় মানুষের প্রেমও স্মরণীয় হয়ে উঠে। কারণ এই প্রেমের তত্ত্বের উৎসসন্ধানে বহু বিশ্ববিখ্যাত কাব্য-সাহিত্য ও শিল্পকর্মের সৃষ্টির ইতিহাসও উন্মোচিত হয়ে যায়। দান্তে, শেলী, বায়রণ. ব্রাউনিঙ-দম্পতি, লিওনার্ডো, গ্যেটে প্রভৃতির প্রেমোপাখ্যান এখানে স্মরণীয়। আরও স্মরণীয় মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী, হাফিয. ওমর খৈয়াম. আমীর খসরুর কথা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে দান্তের বিয়েত্রিসের মতো নিযাম নাম্নী এক বিদুষী ও রূপসী কন্যা ইবনুল আরাবীরও মানসী ছিলো, এবং কলংক অপনয়নের অজুহাতে তিনি প্রেমিকার উদ্দেশ্যে রচিত কবিতাবলীর নিষ্কাম সুফী-দর্শনের রূপ দিয়েছিলেন।[২] যেমন দিয়েছিলেন বৈষ্ণবকবিচূড়ামণি চণ্ডীদাস রজকিনী রামীর সঙ্গে প্রেমের এরূপ ব্যাখ্যা: রজকিনী প্রেম/ নিকষিত হেম/ কামগন্ধ নাহি তায়।

বাংলা সাহিত্যে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদভ্রান্ত প্রেম' ও কবি অক্ষয়-কুমার বড়ালের 'এষা' কাব্যের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য; এ দুখানিরও সৃষ্টি হয়েছিল প্রেমিকা-পত্নীর মৃত্যুর পর বিরহতাপদগ্ধ মানস থেকেই।

ইদানিং বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় কবি-সাহিত্যিক শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনী দু-একখানা নযরে পড়ে, কিন্তু তাঁদের প্রেমঘটিত কোনও কথার ইঙ্গিত মাত্রও থাকে না। আবুল ফজল নজরুল-সম্পর্কিত প্রাগুক্ত প্রবন্ধে এ আশ্বাসও দিয়ে-

ছিলেন ঃ নজরুল-প্রিয়াদেরও সংকোচ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। বরং নজরুলের মতো এমন শক্তিমান ও সৌন্দর্যপিয়াসী কবির হৃদয়-মন তাঁরা আকর্ষণ করতে পেরেছেন, জয় করতে পেরেছেন, হোক না তা সাময়িকভাবে, তাতেও প্রচুর সান্ত্বনা ও গৌরব রয়েছে, তাতেও তাঁরা হয়েছেন অনন্যা, বিশিষ্টা। আবুল ফজল পাশ্চাত্ত্য-খণ্ডের নজীর দিয়ে একথাও বলেছেন যে, শেলী, বায়রণ প্রভৃতির প্রিয়ারা বা তস্য প্রিয়ার আত্মীয়রাও তার জন্য কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করা দরকার মনে করেননি। কিন্তু তিনি ভেবে দেখেননি যে এটা প্রাচ্য-খণ্ড, এখানে আমরা রক্ষণশীল সমাজে বাস করি এবং সমাজবিগর্হিত প্রেম নিয়ে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনার প্রয়াসও গোঁড়া রুচিবাগীশেরা নিন্দার চোখে দেখেন। আমরা ভুলে যাই যে রেঁামা রেঁালার নায়ক জঁা ক্রিস্তফের ন্যায় উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিও নিতান্তই অনায়াসে প্রলোভনের ফাঁদে পা দিচ্ছেন; কারণ তাঁর পক্ষে এই অভিজ্ঞতাটুকু তাঁর শিল্পী জীবনের মধ্যে উষ্ণ ভাব প্রবাহ, উত্তেজিত রক্তধারা সঞ্চারণপূর্বক তার উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতা বিধানের জন্যে অত্যাবশ্যক। তারপর তাঁর জীবনের প্রসার এতো অধিক ও বহুমুখী, এর গতিবেগ এতো প্রবল ও উদ্দাম যে, এক আধটুকু কলঙ্কস্পর্শ এই প্রবল জীবন-প্রবাহে নিশ্চিহ্ন হয়েই ধুয়ে মুছে যায়। জীবন-দর্শনে এই উদার দৃষ্টিভঙ্গির অভাব হেতু আমরা এখনও সংকীর্ণ চোখে নরনারীর সম্পর্কটা বিচার করি। এবং সেহেতু আমরা বরণীয় ব্যক্তির প্রেমকথাও পঙ্কিল বিকৃতরূপে দেখে থাকি। এজন্যেই এদেশে এ শ্রেণীর সাহিত্যের দুর্ভিক্ষ লক্ষিত হয়। কিছু দিন পূর্বে শরৎচন্দ্রের প্রেমকাহিনী নিয়ে একখানি গ্রন্থের বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করেছিলেম, কিন্তু সেটাও বর্তমানে চাপা পড়ে গেছে।

২

নজরুলের প্রেমকাহিনী নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে তাঁর যৌবনকালীন রূপবর্ণনা করা প্রশস্ত। কারণ নজরুল-প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট পরিচয় বহন করতো তাঁর চেহারা। যখন তিনি চব্বিশ বছরের পূর্ণ যুবক, তখন ১৩৩০ সালের আশ্বিন মাসের 'কল্লোলে' তাঁর সম্বন্ধে এই পরিচয়লিপি প্রকাশিত হয় ঃ

কবি নজরুল ইসলাম—বলিষ্ঠ-সুগঠিত দেহ, মাথায় বড় বড় ঝাকড়া চুল, চোখে চশমা, সামান্য গোঁফ আছে, বিদ্রোহীর মতই উৎসাহে উজ্জ্বল চোখ, বেশী লম্বা নয়।

কবি বুদ্ধদেব বসুর বর্ণনায়ঃ

দেহের পাত্র ছাপিয়ে সব সময়েই উছলে পড়ছে তাঁর প্রাণ, কাছাকাছি সকলকেই উজ্জীবিত করে, মনের যত ময়লা, যত খেদ, যত গ্লানি সব ভাসিয়ে দিয়ে। সকল লোকই তাঁর আপন, সব বাড়ীই তাঁর আপন বাড়ী। শ্রীকৃষ্ণের মতো, তিনি যখন যার—তখন তাঁর। জোর করে একবার ধরে আনতে পারলে নিশ্চিন্ত, আর উঠবার নাম করবেন না, বড়ো বড়ো জরুরি এনগেজমেন্ট ভেসে যাবে।···

হয়তো দুদিনের জন্য কলকাতার বাইরে কোথাও গাইতে গিয়ে সেখানেই এক মাস কাটিয়ে এলেন। সাংসারিক দিক থেকে এ-চরিত্র আদর্শ নয়, কিন্তু এ-চরিত্রে রম্যতা আছে তাতে সন্দেহ কী। সেকালে বোহেমিয়ান চালচলন অনেকেই রপ্ত করেছিলেন—মনে-মনে তাঁদের হিসেবের খাতায় ভুল ছিলো না—জাত-বোহেমিয়ান এক নজরুল ইসলামকেই দেখেছি। অপরূপ তার দায়িত্বহীনতা।[৩]

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুলের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাও উপভোগ্যঃ

···কি ভালোই লেগেছিল নজরুলকে প্রথম আলাপে। সবল শরীর, ঝাকড়া চুল, চোখ দুটি যেন পেয়ালা, যে-পেয়ালা খালি নেই, প্রাণের অরুণ রসে সদাই ভরপুর। গলাটি সারসের মতো পাতলা নয়, পুরুষের গলা যেমন হওয়া উচিত তেমনি সবল, বীর্য-ব্যঞ্জক। ঢেউএর আঘাতের মতো, ঝড়ের ঝাপটার মতো তার গান আছড়ে পড়তো স্রোতের বুকে। অনেক চিকণ গলার গাইয়ের চেয়ে নজরুলের মোটা গলার গান আমার লক্ষগুণ ভালো লাগতো ···।[৪]

ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত বলেছেনঃ

> যৌবনে নজরুলের গায়ের রঙ ছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। চেহারায় ছিল আর্যের লক্ষণ। হাঁটার সময় মাথায় কোঁকড়ানো চুলগুলি নাচত। তাঁর লেখা বিদ্রোহী ভাবাত্মক গানগুলি যেন মূর্ত হয়ে উঠতো তাঁর বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহে।[৫]

আমি নিজে বাল্যকালে নজরুলকে প্রথম চোখে দেখেছিলাম ১৯২৫ সালের ৬ই মার্চ বর্ধমান টাউন হল ময়দানের বিশাল জনসমুদ্রে গান পরিবেশন করতে। তখন প্রত্যক্ষ করেছিলাম তারুণ্যের, যৌবনের একটা মূর্ত প্রতীক। অমন সুগঠিত সুপুষ্ট দেহ, অমন পলকে মায়াভরা, পলকে অগ্নিঝরা চোখ জীবনে আর দ্বিতীয়বার প্রত্যক্ষ করিনি। গান গেয়ে চলেছেন, যেন প্রাণ-সঞ্জীবনী সুরের ধারা ছড়িয়ে যাচ্ছে সবখানে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বলেছেন, 'নজরুলের গান অর্থাৎ Gun না হলে আমার Inspiration আসে না।' নজরুলের গানের এই উদ্দীপনা-শক্তিতে তখন সারা যুক্তবাংলা সন্দীপিত হয়ে উঠেছিলো।

এই ছিল যৌবন-ধন্য তারুণ্য-ভাস্বর নজরুলের রূপরেখা। এ ছাড়া ছিল নজরুলের চেহারার মধ্যে নারীকে আকর্ষণ করবার প্রবল শক্তি—এই শক্তি কেবল চেহারার সৌন্দর্যের উপর সবসময় নির্ভর করে না। আবার এসবের সংগে ছিল নজরুল-সাহচর্যের প্রবল আকর্ষণ—যা নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলকে টানতো। একবার নজরুল-বৃত্তের খপ্পরে পড়লে দুনিয়া ভুলে যেতে হতো। আলোচ্য গ্রন্থের দু নম্বর চিঠিতে নজরুল নিজেই বলেছেন :

> আমার একজন বন্ধু আছেন সাতকড়ি মিত্র। রংপুরে ইকনমিক্‌সের অধ্যাপক। তিনি বাড়ী এলে আমার কাছেই থাকতেন দিনরাত—তখন আমি কলকাতায় থাকতাম। তাই দেখে তার স্ত্রী জানালায় দাঁড়িয়ে আমায় "সতীন" "সতীন" বলে গাল দিতেন। অনেক বন্ধুর স্ত্রীরই আমি "সতীন"।

এই যখন বন্ধুদের নাজেহাল অবস্থা, তখন বান্ধবীরা কি নিদারুণভাবেই আকর্ষিতা হতেন, সহজেই অনুমেয়।

৩

বিদ্রোহী কবিতায় কবি নজরুল বলেছেন, "মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য।" তাঁর রণ-তূর্যের বজ্রধ্বনি জ্বালাময়ী সুরে উদ্‌গীত হয়েছে 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান' প্রভৃতিতে, যার ভয়ঙ্কর প্রলয়োল্লাসে তৎকালীন বিদেশী শোষণসর্বস্ব শাসকশ্রেণী শ্বেত ফেরাউনদের বুক কেঁপে কেঁপে উঠেছে, বারে বারে পৌণে দুশো বছরে গড়া সাম্রাজ্যের ভিত্তিটা নড়ে উঠেছে। আর পুরাণ-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুরের মতো তাঁর বাঁশের বাঁশরীতে 'কতো কুলবধূ ছিঁড়ে শাড়ী কুলের কাঁটায়'—কতো তরুণীর বুক ভেঙেছে, চিত্ত-বৈকল্য ঘটেছে, সে-কাহিনী অলিখিত রয়ে গেছে। একই সঙ্গে দুহাতে তরবারী ও বাঁশীর খেলা দেখানো, মেঘ ও রৌদ্রের, হাসির ও অট্টহাসির, সর্বনাশের ও সুন্দরের ঘণ্টা বাজানো এক নজরুল ব্যতীত আর কোনও কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি।

শোনা যায়, নজরুল ইসলামের প্রথম পরিণীতা স্ত্রী নার্গিসও নজরুলের বাঁশীর সুরে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বাঁশী বাজানোতেও নজরুলের পারদর্শিতা কম ছিলো না। 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী' রূপকভাবেই নয়, বাস্তব পক্ষেও সত্য ছিল।

নজরুলের প্রেমকথা আলোচনায় একথা প্রথমেই পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, আমার মতে নজরুলের এই হৃদয়-বৃত্তির দুটি বৃত্ত ছিল। প্রথম বৃত্তের একক সম্রাজ্ঞী তাঁর দ্বিতীয়া পরিণীতা স্ত্রী—প্রমীলা ওরফে আশালতা ওরফে দোলন ওরফে দুলি—যিনি আজীবন সুখে-দুঃখে নজরুলের প্রাণসঙ্গিনী হিসেবে জীবনপাত করে গেছেন বর্তমান নির্বিকার নির্বাক ও জড়প্রায় স্বামীর পদপ্রান্তে। এ বৃত্তে প্রমীলা 'বিজয়িনী' ও 'পূজারিণী'—'দোলনচাঁপা' কবির কণ্ঠে শুধু তাঁর তরেই। "যুগযুগান্তরের কড়িকোমল সুরে' আলোছায়ার আলপনায় ও সদাসতের ব্যঞ্জনায় প্রেম জীবনের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে"।[৬] কবি প্রেম-পিপাসার অপূর্ব প্রকাশে, -বেদনা উচ্ছ্বাসে এই চিরন্তনী মানস-প্রতিমাকে বলছেন ঃ

বিজয়িনী নহ তুমি নহ ভিখারিণী
তুমি দেবী চির-শুদ্ধা তাপস কুমারী, তুমি মম চিরপূজারিণী।

দ্বিতীয় বৃত্তে স্থান নির্ধারিত করা যায় 'অনামিকা' দলের, যাদের জন্য কবির 'দুপুর-অভিসার' ও 'মাধবী-প্রলাপ'। অনামিকার জন্যে নজরুলের প্রেম সর্বসংস্কার-মুক্ত, আবেগউচ্ছল ও যৌবনমদমত্ত। 'অনামিকা' কবিতায় এসব অনাগত প্রিয়ার যে রূপকল্প চিত্রিত হয়েছে, যে ভাষায় তাদের বন্দনা করা হয়েছে, এবং তাদের জন্যে প্রেমের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেসব বিবেচনা করে বলা যায়, তারা শুধুই বাসনাসঙ্গিনী এবং তীব্র জীবনপিপাসায় ও সম্ভোগতৃষ্ণায় এ-প্রেম পর্যবসিত—"উদ্বেলিত বুকে শুধু অতৃপ্ত যৌবন ক্ষুধা উদগ্র কামনা"ই জাগায় :

তোমারে বন্দনা করি
স্বপ্ন-সহচরি
লো আমার অনাগত প্রিয়া
আমার পাওয়ার বুকে না পাওয়ার তৃষ্ণা জাগানিয়া।
তোমার বন্দনা করি........
হে আমার মানস-রঙ্গিনী
অনন্ত-যৌবনাবালা, চিরন্তন বাসনা-সঙ্গিনী।

* * *

অরূপা লো! রতি হয়ে এলে মনে
সতী হয়ে এলে না ক ঘরে।

* * *

যা কিছু সুন্দর হেরি করেছি চুম্বন
যা কিছু চুম্বন দিয়া করেছি সুন্দর—
তিলোত্তমা, তিলে তিলে।
করেছি চুম্বন তোমা প্রতি তরুণীর ঠোঁটে।

* * *

আজ মনে হয়
প্রেম সত্য চিরন্তন প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়।

* * *

তোমারে করিব পান, অনামিকা, শত কামনায়,
ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়।

অনামিকা প্রিয়াদের উদ্দেশ্যে যে-সম্ভোগ-সম্পৃক্ত প্রেমের নগ্নরূপ প্রকটিত হয়েছে 'অনামিকা' কবিতায়, তার প্রতি তীব্র কশাঘাত করে মোহিতলাল মজুমদার যে সমালোচনা করেছিলেন, তা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত একথাও এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই সময় নজরুলের সঙ্গে মোহিতলালের তীব্র বিচ্ছেদ জন্মে এবং শনিবারের চিঠিতে বারংবার নজরুলকে আক্রমণ করে মোহিতলাল ব্যঙ্গ কবিতা ও কঠোর সমালোচনা প্রকাশ করতে থাকেন :

> কবির প্রেয়সীই অনামিকা অর্থাৎ নামহীনা, তাহার কারণ তাঁহার কামতৃষ্ণা কোন নাম-নির্দিষ্টা নায়িকাতে আবদ্ধ নহে। বিশ্বের যাহা কিছু মৈথুনযোগ্য তাহাকেই পাত্র করিয়া তিনি তাঁহার কাম পরিবেশন করিতেছেন। আবার নারী মাত্রেই তাঁহার সেই অনামিকা প্রেয়সী—কেননা, তাহাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের ধার তিনি ধারেন না, তাহার সেই এক অভিন্ন রতিরসের পাত্র বইত নয়? অতএব তিনি কামের পাত্র বিচার করেন না—এ বিষয়ে তিনি একরকম Pan-মৈথুন-ist।[৭]

নজরুলের প্রেমকথাকে আবুল ফজল বলেছেন, প্রথম যৌবনের পাগলামো ও দায়িত্বহীনতা; আর বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণের মতো—যখন যার তখন তার। নজরুল ছিলেন অসীম প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা, আবেগ-উচ্ছল। তিনি ঘরে ঘরে পরমাত্মীয়া খুঁজেছেন, বোন ও মা হিসেবেও। কুমিল্লায় বীরেন্দ্রকুমারের মাতা ও প্রমীলার কাকীমা বিরজাসুন্দরী দেবীকে দেখামাত্রই মা ডাকতে আরম্ভ করেছেন; গোবরডাঙার ঘটক পরিবারের সুনীতিবালা দেবীকে মা বলতেন; হুগলীর মিসেস এম. রহমান সাহেবা ছিলেন 'আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা'। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর 'চিত্তনামা' লিখে উৎসর্গ করেছেন 'মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে'। নজরুলের এই সহজ সরল ভক্তিপ্রীতির প্রকাশ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে নারীজাতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিলো কি অপরিসীম।

কিন্তু অপ্রীতিকর হলেও এখানে একটি তথ্য উদঘাটন করা বাঞ্ছনীয়। নজরুল আপন মায়ের বা পিতার নামে কোনও কবিতা লেখেননি, তাঁদের কারও নামের সঙ্গে কোন গ্রন্থ জড়িত করে রাখেননি। হুগলী জেলে আবদ্ধ থাকা কালে যখন নজরুল অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেন তখন তাঁর মা চুরুলিয়া থেকে পাগলিনীর মতো ছুটে এসেছিলেন পুত্রের অনশন ভাঙাতে। কিন্তু

নজরুল তখন মায়ের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেননি। অথচ কুমিল্লার বিরজা-সুন্দরী দেবীর অনুরোধে নজরুল অনশন ভঙ্গ করেন। আপন মায়ের প্রাত এই উপেক্ষা ও অবহেলা অনেকের চোখে বিসদৃশ ঠেকে ও প্রশ্ন ওঠে, এর কারণ কি ?

আমাকেও একদিন ঠিক এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল আমার পুত্রকন্যার নিকটে। নজরুল চরিতকাররা সংকোচবশতঃ এ প্রশ্নটি এড়িয়ে গেছেন। মুজাফফর আহম্মদ এ-প্রসঙ্গ উত্থাপনই করেননি, আবদুল কাদির 'কোনও এক অজ্ঞাত কারণ' বলেই এড়িয়ে গেছেন। ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত বলেছেন, ১৯১৯ সালে পল্টন ভেঙে দেওয়া হলে 'কলকাতায় দুদিন অবস্থানের পর নজরুল একবার সাত আট দিনের জন্য চুরুলিয়ায় গিয়েছিলেন। সেই সময় চুরুলিয়ার বাড়ীতে এমন একটা ব্যাপার ঘটেছিল, যার জন্য নজরুল আর কখনও বাড়ী যেতে চাননি।'[১৮] ১৩৩৫ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ নজরুল-মাতা জাহেদা খাতুন জান্নাতবাসী হন। তখনও নজরুল চুরুলিয়া যাননি এবং আর কখনও চুরুলিয়া-মুখো হননি।

মাতার প্রতি নজরুলের এই ঔদাসীন্যের কারণ হলো, জাহেদা খাতুন নজরুলের পিতৃব্য বজলে করীমকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন। কাজী বজলে করিম আরবী-ফারসী-উর্দুতে শিক্ষিত ছিলেন এবং এই পিতৃব্যের সাহচর্য, প্রেরণা ও উৎসাহে নজরুল আরবী-ফারসী-উর্দু মিশ্রিত বাংলায় কাব্যচর্চায় উৎসাহী হন। পুত্রের সহজাত বিতৃষ্ণা নিয়ে নজরুল মাতার দ্বিতীয় বিবাহ—লোকাচারে ও ধর্মে সমর্থিত হলেও—স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। এবং এই অভিমানবশতঃ আর মাতার মুখদর্শন করেননি।

৪

নজরুল-প্রেমিকাদের কেউ স্ফুট, কেউ অর্ধস্ফুট এবং অনেকেই এখনও অপরিস্ফুট রয়ে গেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রকাশে মিস ফজিলতুন্নেসার নাম সুপরিস্ফুট হলো। এই প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার পূর্বে নজরুল ও ফজিলতুন্নেসার আরও পরিচয় জ্ঞাত হওয়া দরকার।

নজরুলের জন্ম হয় ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে। ১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় (১৯২১) নার্গিস বেগমের সঙ্গে তাঁর আকদ হয়, কিন্তু সহসা বিচ্ছেদ ও তালাক হয়। ১৯২৪ সালের ২৪শে এপ্রিল নজরুলের সঙ্গে প্রমীলা সেনগুপ্তার বিবাহ হয়। ১৯২৬ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে নজরুলের প্রথম সন্তান বুলবুল (খালেদ অরিন্দম) জন্মগ্রহণ করে।

মিস ফজিলতুন্নেসা ১৯০৫ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি অংকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম. এ. পাশ করেন; ১৯২৯ সালে বিলাত যাত্রা করেন সরকারী বৃত্তি লাভ করে। ১৯৩৩ সালে প্রত্যাবর্তন করে প্রথম সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন ও খানবাহাদুর আহসান-উল্লাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র শামস্-জ্জোহার সঙ্গে পরিণীতা হন। আযাদী লাভের পরপরই তিনি ইডেন মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন, কিন্তু ১৩.৮.৫৬ তারিখে সাসপেণ্ড হন।[৯]

এখানে আলোচ্য গ্রন্থের একটি ভুল তথ্য নিরসন হওয়া দরকার। বলা হয়েছে 'মোহামেডান এডুকেশনের এ. ডি. পি. ই. খানবাহাদুর আব্দুল লতিফের সংগে পরামর্শ করে নাসিরুদ্দীন সাহেব (সওগাত-সম্পাদক) শিক্ষামন্ত্রী নওয়াব মোশাররফ হোসেনের সংগে দেখা করে মিস্ ফজিলতুন্নেসাকে বিলেত পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন' (১৩ পৃঃ)। প্রকৃত ব্যাপার এই যে খানবাহাদুর আব্দুল লতিফ নামে কোনও ভদ্রলোক 'মোহামেডান এডুকেশনের এ. ডি. পি. আই.' কোন কালে ছিলেন না। খানবাহাদুর আহসানউল্লাহ আই. ই. এস. ১৯২৪ সালে তদানীন্তন বঙ্গদেশে মোছলেম শিক্ষার সহকারী ডিরেক্টর পদে মিষ্টার টেলর সাহেবের স্থলে নিযুক্ত হন। '১৯২৯ সালে আমার ৫৫ বৎসর পূর্ণ হয় এবং তৎপর আমি অবসর গ্রহণ করি।......ইতিপূর্বে কোন ভারতবাসী সহকারী ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন নাই। আমি অবসর গ্রহণ করিলে মিঃ বটম্‌লি তৎপদে নিযুক্ত হন।'[১০]

শুধু তাই নয় তিনি ফজিলতুন্নেসাকে বৃত্তিপ্রাপ্তি সম্বন্ধে যে সাহায্য করে ছিলেন সে বিষয়েও তিনি বলেছেন:

> মিস ফজিলতুন্নেসা এম. এ. যখন বিলাতে ছিলেন, তখন তাহার সহিত মিঞার (অর্থাৎ পুত্র জোহার) সাক্ষাৎ হয় ও নানাভাবে

তিনি মিঞাকে সাহায্য করেন। আমি ডিরেক্টর অফিসে থাকিতে প্রস্তাব হইয়াছিল একটি উপযুক্ত মোছলেম মহিলাকে বৃত্তি দিয়া বিলাতে ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠাইতে এবং ট্রেনিং অন্তে ইনস্পেক্ট্রেস বা তত্তুল্য কোন পদে নিয়োগ করিতে। ভবিষ্যত মোছলেম মহিলাদিগের উচ্চশিক্ষার উন্নতিকল্পে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। আমার সৌভাগ্য যে বিলাত পাঠাইবার সময় আমি আমার ভবিষ্যত পুত্রবধূকে সাহায্য করিবার অবসর পাইয়াছিলাম। তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, তিনিই অবশেষে আমার পুত্রবধূ হইবেন। ঐ সময়ে শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, জলপাইগুড়ির নওয়াব মোশার্রফ হোসেন। গভর্ণমেন্ট হইতে এই বৃত্তির মূলে ছিলেন তিনি, সেজন্য তাঁহার নিকট আমি চিরঋণী।[১১]

উপরের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার জানা যায়, নার্গিস বেগমের সঙ্গে পরিচয়ের সময় নজরুল বাইশ বছরের নওজোয়ান, প্রমীলার সঙ্গে বিবাহের সময় তাঁর বয়স পঁচিশ বছর; এবং ফজিলতুন্নেসার সঙ্গে পরিচয়ের সময় তাঁর বয়স উনত্রিশ বছর ও গৃহে পত্নী ও পুত্র বিদ্যমান। তিনি প্রথম কুমিল্লা যান ১৩২৭ সালের চৈত্রমাসে এবং ট্রেনে বসেই 'নীল পরী' কবিতা রচনা করেন। প্রথমে তিনি কয়েকদিন কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় থেকে যান। এখানেই সর্বপ্রথম প্রমীলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। অনুমান করা অন্যায় হবেনা যে, নার্গিসের পূর্বেই প্রমীলা দেবী নজরুলের হৃদয়ে প্রথম আসন অধিকার করেছিলেন। অতঃপর দৌলতপুর গেলে নার্গিস বেগম তাঁর বাঁশির সুরে মুগ্ধ হন, এবং মন-দেয়া-নেয়া হয়ে যায়। নজরুল দৌলতপুরে ৩রা আষাঢ় পর্যন্ত থাকেন এবং আক্‌দ-অন্তে পরদিন ভোরেই বীরেন্দ্রকুমারের সঙ্গে দৌলতপুর ত্যাগ করে কান্দির পাড়ায় উপস্থিত হন। উল্লেখযোগ্য যে বিরজাসুন্দরী দেবী প্রমীলাসহ বাড়ীর এগার জনকে নিয়ে দৌলতপুরে বিবাহবাড়ীতে উপস্থিত হন। এখানে বিবাহের পূর্বে বিরজাসুন্দরী একসময় নজরুলকে এ বিবাহ করতে নিষেধও করেছিলেন। যাহোক, আক্‌দ-অন্তে নজরুল পলাতক হলে বিরজাসুন্দরীও স্বগৃহে সদলবলে প্রত্যাগতা হন।[১২] দ্বিতীয় দফায় নজরুল কান্দিরপাড়ে অবস্থান করেন, মুজাফফর আহমদ সাহেব কলিকাতা থেকে সেখানে যেয়ে তাঁকে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত।

অতঃপর নজরুল ঐ বছরেরই (১৩২৮) অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাসে এবং পরবর্তী জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে (১৩২৯) ঘন ঘন কুমিল্লা যান। 'ছায়ানট'র অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির নীচে রচনার স্থান কাল নির্দেশ থেকেই আমার এ বক্তব্যের সত্যতা নির্ণীত হবে।[১৩] এ সব থেকে আমি অনুমানে আরও সুদৃঢ় যে, নজরুল হৃদয়াকাশে সর্বপ্রথম প্রমীলা দেবীরই প্রেমশশী উদিত হয়েছিল, নার্গিস দ্বিতীয়া ও দুঃস্বপ্নের মতোই নজরুলের জীবনে উদিতা হয়েছিলেন। এবং প্রমীলা-শশী-উদ্ভাসিত আকাশে ধূমকেতুর মতো সহসা উদিত হয়ে ক্ষণিক পুচ্ছতাড়নায় প্রমীলা-শশীকে নিষ্প্রভ করতে সক্ষম হলেও নার্গিস স্থায়ী আসন অধিকার করার মতো ভাগ্যবতী ছিলেন না।

এবার নজরুল-ফজিলতুন্নেসার সম্পর্ক আলোচনা করা যেতে পারে। নজরুল ১৯২৭ সালে সর্বপ্রথম ঢাকায় আসেন ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে মুসলিম সাহিত্য-সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করতে। তখন ঢাকায় মাত্র দুদিন থেকেই তিনি কৃষ্ণনগর ফিরে যান। নিঃসন্দেহে এবার তাঁর সঙ্গে ফজিলতুন্নেসার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। দ্বিতীয়বার আসেন মুসলমান সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে। এবার বেশ কিছুদিন তিনি ঢাকায় অবস্থান করেন ও অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও হৃদ্যতা জন্মে। তন্মধ্যে কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব বিশিষ্ট।

সৈয়দ আলী আশরাফ বলেছেন, এই সময় নজরুল আড়াই মাস ঢাকায় ছিলেন এবং 'এই আড়াই মাসের নজরুল-জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো তাঁর প্রেম। মিস্ ফজিলতুন্নেসাকে তিনি গভীর ভাবে ভালবেসেছিলেন' (১১ পৃঃ)। নজরুল এ অভিযানকে তীর্থযাত্রা বলেছেন, যখন তাঁর দুটী প্রাপ্য ঘটেছে—'প্রাণের বন্ধু তোমায়' অর্থাৎ কাজী সাহেব, এবং 'চোখের জলের প্রিয়াকে' অর্থাৎ মিস্ ফজিলতুন্নেসা।

ফজিলতুন্নেসা নিঃসন্দেহে কবির হৃদয়ে তৃতীয়ার চাঁদ—অবশ্য কবির স্ফুট প্রেমিকাদের সংখ্যা ধরে এবং অনামিকাদের সংখ্যা আপাততঃ হিসেবের বাইরে রেখে। কবি ফজিলতুন্নেসাকে বলেছেন, 'সে আমার আজকের নয়, সে আমার জন্মজন্মান্তরের লোকলোকান্তরের দুখ-জাগানিয়া। তার সাথে নব নব লোকে

এই চোখের জলে দেখা এবং ছাড়া ছাড়ি' (৩৫ পৃঃ)। এখানে নর্গিস সম্পর্কে কবির উক্তি স্মরণীয়। বলে রাখা ভাল যে, প্রমীলাকে বিবাহপূর্ব ও বিবাহোত্তর কালে লেখা নজরুলের কোনও চিঠিপত্র আজও প্রকাশিত হয়নি, অতএব নজরুল তাঁকে কী ভাষায় ও কী বিশেষণে সবিশেষ সম্বোধন করতেন তা অজ্ঞাত। কিন্তু নার্গিস সম্বন্ধে বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন :

> যাঁকে পেয়েছিস্ তিনি যে তোর 'চির-জনমের হারানো গৃহলক্ষ্মী' একথা সত্যি যদি এতটুকু সত্য হয়, তাহলে তোর সৌভাগ্যে আমার সত্যিই ঈর্ষা হচ্ছে।...লিখেছিস : 'এক অচেনা পল্লী বালিকার কাছে এত বিব্রত আর অসাবধান হয়ে পড়েছি, যা কোন নারীর কাছে কখনও হইনি'...জেনে খুশী হলাম যে 'তাঁর বাইরের ঐশ্বর্যও যথেষ্ট আছে'[১৪]...।

লক্ষ্য করার মতো যে, বাইশ বছরের নওজোয়ান নজরুল নার্গিসকে দেখা-মাত্রই চিরজনমের হারানো গৃহলক্ষ্মী মনে করেছেন ; আবার ঊনত্রিশ বছর বয়সে পুত্রের পিতা ও স্ত্রীর স্বামী হয়েও তিনি ফজিলতুন্নেসাকে জন্মজন্মান্তরের, লোক-লোকান্তরের প্রিয়া ভেবেছেন। কারণ কবি চির-কিশোর, উঞ্চ চির-অধীর, প্রিয়া-মাত্রেই তাঁর চোখে অনন্তকালের মানসী। প্রিয়াতে প্রিয়াতে তাঁর চোখে পার্থক্য ধরা দেয়নি।

কিন্তু মিস ফজিলতুন্নেসা বড়ো হিসেবী। তিনদিনে তাঁদের মধ্যে কতোটুকু সামীপ্য ঘটেছিল, কতোখানি অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল, নজরুলের কাজী সাহেবকে লিখিত পত্রাবলীতে তার উচ্ছ্বাসবহুল প্রকাশ ব্যতীত আর কোথাও কোন সাক্ষ্য মিলবে না। সৈয়দ আলী আশরাফ বলেছেন, এ প্রেম ছিল প্রধানতঃ একতরফা, মিস ফজিলতুন্নেসা তাঁকে আশানুরূপ প্রতিদান দেন নি (১১ পৃঃ)। এ কথায় সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই যে, ফজিলতুন্নেসা নজরুলকে কোনও প্রশ্রয় দেন নি। উপরন্তু 'কবির খেয়াল' বলে নজরুলের প্রেমকে ব্যঙ্গোক্তি করেছেন এবং কবি-হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছেন। ফজিলতুন্নেসাকে লেখা নজরুলের ৫ নম্বর চিঠি-খানিতে কোনও সম্বোধন নেই, প্রেমের বাষ্পমাত্রও নেই। এ থেকে অনুমেয় যে, নজরুল এই চিঠি লেখার সময় কতোখানি চিত্তদমন করেছেন, আঘাতটাও কাটিয়ে উঠেছেন। এই চিঠিখানিও কাজী সাহেবের চিঠিগুলির সঙ্গে ছিল দেখে

অনুমান হয়, ফজিলতুন্নেসা এ চিঠির জওয়াব দিয়ে সাধারণ ভদ্রতাও রক্ষা করেন নি, চিঠিখানি কাজী সাহেবকে তুলে দিয়ে যথাবিহিত উত্তর দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ সব থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, ফজিলতুন্নেসা নজরুলের প্রেমের প্রতিদান দেওয়া দূরে থাক, তাঁকে চিঠি দেওয়াও প্রীতির চোখে দেখেননি।

কাজী সাহেব নজরুল-ফজিলতুন্নেসা দেখা-সাক্ষাতের মিলন-সেতু, এ ইঙ্গিত চিঠিগুলিতে আছে। ২ নম্বর চিঠিতে লেখা "সেতুই কি শেষে জলে পড়ে গেল?" (৪৩ পৃঃ) অনেকখানি অর্থবহ। কাজী সাহেবকে নজরুল বলেছেন: 'নিঃস্বার্থ, কোমল, অভিমানী প্রেমিক—কিন্তু সবকে গোপন করতে চাও যেন! তোমার তৃষ্ণা আছে, কিন্তু নেলসনের মত তোমার তৃষ্ণার বারি অনায়াসে আরেকজনের মুখে তুলে দিতে পার।' (৩৭ পৃঃ) কাজী সাহেবের এ গুণাবলী তাঁর নিন্দুকরাও স্বীকার করবে। আমরা তাঁকে দেখেছি বিদগ্ধ অসূয়ামুক্ত শালীন, সংযতবাক্ ও চাপা প্রকৃতির। এজন্যেই সৈয়দ আলী আশরাফ তাঁর প্রিয়তম ছাত্র হয়েও তাঁর মুখ থেকে কিছু মাত্র আদায় করতে পারেননি, তাঁর দৌত্যকর্মের সীমানা কতোখানি ছিল ও পরিণাম কি হয়েছিল? কিন্তু কাজী সাহেবও যে নিজে কোনকালে এ বিষয়ে মুখ খুলবেন, সে সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। তবে কি এ অধ্যায় অলিখিতই থেকে যাবে?

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ফজিলতুন্নেসা বিলাত যাত্রার বন্দোবস্ত করতে কলকাতা যান এবং এ সময় নাসিরুদ্দীন সাহেবের আতিথ্যে ১১ নম্বর ওয়েলস্লী স্ট্রীটের অফিসগৃহের উপরতলায় কিছুদিন অবস্থান করেন। ১৯২৯ সালের গোড়ার দিকে নজরুলও কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় চলে আসেন, এবং 'সওগাত' অফিসের দুখানা কামরা কিছুকাল দখল করে বাস করেন। তারপর তিনি উঠে যান এণ্টালি অঞ্চলে পানবাগান লেনের বাড়ীতে। সওগাত অফিসে নজরুল সপরিবারে বাস করতেন। এই যোগাযোগে নজরুল ও ফজিলতুন্নেসার মধ্যে কোনও নতুন অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল কিনা তার কোন সূত্র মেলে না। আলী আশরাফ বলেন, "নাসিরুদ্দীন সাহেব তখন নজরুলের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু এর গভীরতা অনুমান করতে পারেন নি" (১১ পৃঃ)। আমরা এ সময় নজরুলকে কেবল ফজিলতুন্নেসার বিলাতগমন উপলক্ষে একটি গান রচনা করতে দেখেছি:

"জাগিলে পারুল কিগো 'সাত ভাই চম্পা' ডাকে"। বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ফজিলতুন্নেসা এটর্নির পত্নী ও কলেজের অধ্যাপিকার ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু অতঃপর নজরুলের সংঙ্গ তাঁর কোনও হৃদ্যতা, এমন কি দেখা-সাক্ষাতেরও কথা কেউ বলেন না। ফজিলতুন্নেসা তখন নজরুলের হৃদয়াকাশ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন।

৫

আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় সৈয়দ আলী আশরাফ বলেছেন, "এ বইতে নজরুল ইসলামের আটটি অপ্রকাশিত চিঠি প্রকাশিত হ'ল।" প্রকৃতপক্ষে আমরা নয়খানা চিঠি পাই; আটটি কাজী সাহেবকে ও একটি মাত্র ফজিলতুন্নেসাকে লেখা। কাজী সাহেবকে একটি চিঠিতে 'প্রিয় মোতাহার' একটিতে "বন্ধু!" ও ছয়খানি চিঠিতে "প্রিয় মোতিহার" সম্বোধন করা হয়েছে।

চিঠিগুলি উদ্ধার করে ও প্রকাশ করে সৈয়দ আলী আশরাফ বাংলা সাহিত্যের একটি অশেষ উপকার করেছেন। বাংলা সাহিত্যের একজন দিকপালের প্রেমের কাহিনী হিসেবে সাধারণ পাঠকমহলে তা যতোই উপভোগ্য হোক না, নজরুল সাহিত্যের নিবিষ্ট ও মর্মানুগ্রাহী পাঠকের নিকট সেগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি বলেছেন:

> নজরুলের এই চিঠিগুলিকেও কাব্য বলে গ্রহণ করা উচিত। কবি অবশ্য কাব্য রচনা করার উদ্দেশ্যে কল্পনার বলে রঙীন করে এগুলো রচনা করেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিজের অন্তলোকের বেদনা এবং কামনাকে বন্ধু মোতাহারের কাছে প্রকাশ করে মনকে হাল্কা করা। কিন্তু এই প্রকাশের ক্ষেত্রে কবি স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর অনুভূতিকে অপূর্ব ভাষার তরঙ্গে দোলায়িত করেছেন। ... মনে হয় যেমন ভাব ও ভাষা এসেছে, তেমনি লিখে গেছেন। ফলে চিঠিতে যে সাবলীল ভঙ্গী থাকে, যেমন উচ্ছ্বাসময়তা থাকে, যেমন আকস্মিক ভাবধারার পরিবর্তন থাকে সেসব তেমনই রয়েছে। ফলে মানুষ নজরুলকে পূর্ণভাবে পাই। সে হিসেবে চিঠিগুলো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পত্রসংগ্রহের মধ্যে স্থান পাবে। চিঠিগুলোর আর একটি

> মূল্য হচ্ছে এগুলো নজরুল-চরিত্র আমাদের কাছে উজ্জ্বলভাবে খুলে ধরে (২৬ পৃ:)।

আমরা একথাগুলির সম্যক্ প্রতিধ্বনি করি। পত্রগুলি নজরুল-চরিত্রই উজ্জ্বলভাবে মেলে ধরে না, তাঁর অনেক কবিতার জন্মকাহিনী এবং অন্তর্নিহিত অর্থপূর্ণ ভাবধারার উপযুক্ত মর্মগ্রহণেও সহায়তা করে। 'নজরুল জীবনের এক অধ্যায়' এবং 'এই পত্রাবলী এবং প্রেমের কবিতা' নিবন্ধ দুটি সুলিখিত ও তথ্য সম্বলিত। এ দুটি পত্রাবলীর মর্মানুধাবনে বিশেষ সহায়ক।

একটি অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেল। ২৪ পৃষ্ঠায় প্রথমে বলা হয়েছে "প্রথম চিঠিতে প্রিয়াকে ফুলবাগানের মক্ষীরাণী এবং অঙ্কশাস্ত্রবিদকে মালী বলে উল্লেখ করার সঙ্গে……।" কিন্তু পরে ২৬ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, "প্রথম পত্রে সমাজকে সেই কঠোর রুক্ষ মালীর পর্যায়ে দাঁড় করিয়েছেন যে মালী মৌ-মক্ষীকে মক্ষীরাণীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।" এরকম অসঙ্গতি দূরীভূত হওয়া উচিত।

এই বিচিত্র প্রেমের বিভিন্ন অনুভূতির আবেগে কবি যেসব গান ও কবিতা রচনা করেছেন, আলী আশরাফ সাহেব সে সবের কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন নিবন্ধ দুটিতে। আমি আরও যোগ করতে পারি, কবি নিম্নলিখিত গানটিও রচনা করেছিলেন এই বিচিত্র অনুভূতির আবেশে :

তোমার আকাশে উঠেছিনু চাঁদ
ডুবিয়া যাই এখন
দিনের আলোকে ভুলিও তোমার
রাতের দুঃস্বপন।
তুমি সুখে থাক আমি চলে যাই,
তোমারে চাহিয়া যেন ব্যথা পাই,
জনমে জনমে এইটুকু চাই
নাই যদি পাই মন।
ভয় নাই সখি রেখে গেনু শুধু
চোখের জলের রেখা;
জলের লিখন শুকাবে প্রভাতে

আমি চলে যাব একা ;
উধ্বে তোমার প্রহরী দেবতা
মধ্যে দাঁড়ায়ে তুমি ব্যথাহতা
পায়ের তলার দৈত্যের কথা
ভুলিতে কতক্ষণ।

অপ্রীতিকর হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি 'পরিশিষ্ট' পর্যায়ে যে দুখানি পত্র মুদ্রিত হয়েছে, তা পরিত্যক্ত হলেই শোভন হতো। এ চিঠি দুখানির সঙ্গে মূল গ্রন্থের কোনও সংশ্রব নেই। আলী আশরাফ বলেছেন, 'এ চিঠি দু'টো কাদেরকে লিখিত তার বিস্তারিত খবর এখনও পাওয়া যায়নি' (৭৫ পৃঃ)। বলাবাহুল্য, দুখানি চিঠির একটিও কবি আবদুল কাদিরকে লিখিত নয়, এ দুটি চিঠির সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই।

প্রথম চিঠিখানি 'স্নেহের ব্রজ' অর্থাৎ ব্রজবিহারী বর্মণকে লেখা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ব্রজবাবু নজরুলের 'সর্বহারা', 'ছায়ানট', 'ফণিমনসা', 'প্রলয়শিখা', 'রুদ্রমঙ্গল', 'দুর্দিনের যাত্রী' গ্রন্থসমূহের প্রথম সংস্করণের প্রকাশক। এহেন অন্তরঙ্গ কবি-বন্ধুকে ঠিকানাবিহীন ও তারিখহীন একখানি চিরকুটে লিখিত হিসেবে পত্রখানি কী সূত্রে কখন ও কোন্ উপলক্ষে ন্যাশনাল ব্যাংকের প্রাক্তন-প্রধান উর্দুভাষী সাহিত্যরসিক জনাব মোমতাজ হাসানের হস্তগত হলো,* তার সঠিক

* ইনকামট্যাক্স অফিসার মরহুম মঈনুদ্দীন সাহেবের এক ভাই করাচীতে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তানের কোনো শাখায় চাকুরী করতেন। জনাব মোমতাজ হাসান সাহেব তাঁকে নজরুলের হস্তলিপির কিছু নমুনা সংগ্রহ ক'রে দেবার অনুরোধ করেন। এ ব্যাপারে মঈনুদ্দীন সাহেব আমার সাহায্য চান। কবি খান মঈনুদ্দীন সাহেবের কাছে নজরুলের চিঠিপত্র কিছু থাকতে পারে, আমার এ বিশ্বাস ছিল। কবি মঈনুদ্দীন সাহেবের কন্যা শামসুজ্জাহান আমার কাছে বাংলায় এম. এ. পড়তেন। তিনি তখন তৃতীয় বর্ষ অনার্স ক্লাসের ছাত্রী। শামসুজ্জাহান ওর বাবার কাছ থেকে আমাকে এ চিঠিটি এনে দেন। আমি দিই ইনকামট্যাক্স অফিসার মঈনুদ্দীন সাহেবকে। উনি আজ আর ইহজগতে নেই। মৃত্যুর দিন চারেক পূর্বে এ চিঠিটি তিনি করাচীতে তাঁর ভাই-এর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে চিঠিটি মোমতাজ হাসান সাহেবের কাছে পৌঁছেছে। মোমতাজ হাসান সাহেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত চিঠিটির এ-ই হলো সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। স. সা. প.।

হদিস তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই বিশদ হতো। 'বিস্তারিত খবরাদি' তাঁর নিকট থেকে সংগ্রহ করলেই পাঠকমন পত্রখানি খাঁটি হিসেবে নিঃসন্দেহ হতো।

দ্বিতীয় পত্রটি সম্বন্ধে উক্ত হয়েছে 'রিয়াজুল ইসলাম সাহেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত' এবং ভূমিকায় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। আমি রিয়াজুল ইসলাম সাহেবকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, কবি মঈনউদ্দীন খানের নিকট থেকে তিনি চিঠিখানির একটি আলোকচিত্র (Photostat copy) সংগ্রহ করেন, এবং তাই তিনি সৈয়দ আলী আশরাফকে দেখিয়েছিলেন। অন্ততঃ উল্লেখ করা উচিত ছিল যে, আলোকচিত্র থেকে এ চিঠিখানি গৃহীত হয়েছে। আমরা সবিশেষ জ্ঞাত আছি যে, চিঠিখানির উদ্দিষ্ট Uncle, নজরুলের স্বগ্রামবাসী দূরসম্পর্কীয় চাচা ডাক্তার (হোমিও) কায়েম হোসেন। চিঠিখানির একটি আলোকচিত্রসহ বাংলা অনুবাদ কবি মঈনুদ্দীন খান লিখিত 'নজরুলের চিঠি' শিরোনামায় 'মাহে নও' পত্রিকার ১৯৫৮ মে, ১৩৬৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পরে 'নজরুল রচনাসম্ভারে'ও বাংলা অনুবাদটি ছাপা হয়। অতএব চিঠিখানির বিস্তারিত খবর দশবছর পূর্বে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠকসমাজ এ-সম্বন্ধে সম্যক্ ওয়াকিবহাল।

নজরুলের সামান্যতম হস্তলিপিও বাংলা ভাষাভাষীর পরম শ্রদ্ধার ও গৌরবের সম্পদ। এ সম্পদ যাঁর অধিকারে আছে, তিনি তা প্রকাশ করলে আমরা নিঃসন্দেহে তাঁকে অভিনন্দন জানাবো। কিন্তু তা মূল হওয়া চাই; শুধু ভঙ্গী দিয়ে বিভ্রান্তি ঘটাবার উৎসাহ যেন না থাকে। এমন সাংবাদিক-সুলভ Stunt সৃষ্টির প্রয়াস মোটেই শোভনীয় নয়। বিশেষতঃ এমন গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থে এ-প্রয়াস বর্জন সর্বথা বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থখানির মুদ্রণ, কাগজ, বাঁধাই ও বহির্সৌষ্ঠব উন্নতরুচির পরিচায়ক। মিস ফজিলতুন্নেসাকে লিখিত পত্রখানির আলোকচিত্রটি এবং কবির ও কাজী পরিবারের আলোকচিত্র দুখানি গ্রন্থখানির মর্যাদাবৃদ্ধি করেছে। সৈয়দ আলী আশরাফের প্রযত্নে ও করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক গ্রন্থখানির প্রকাশনা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। নজরুল-ভক্তদের সংগ্রহে গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে অবশ্যই স্থান লাভ করবে।

তথ্যনির্দেশ ঃ

(১) সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা, পৃঃ ১২৮–১৩৭।

(২) মল্লিখিত 'মুসলিম-মনীষা', পৃঃ ১১৯।

(৩) বুদ্ধদেব বসু ঃ নজরুল ইসলাম (কবিতা পত্রিকা, কার্তিক—পৌষ ১৩৫১) পৃঃ ১৯।

(৪) সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যাত্রী (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ১২৪-২৫।

(৫) নজরুল চরিত মানস, পৃঃ ১৫৩।

(৬) ঐ, পৃঃ ১৯৪-৯৫।

(৭) শনিবারের চিঠি ঃ ১৩৩৪ কার্তিক সংখ্যা।

(৮) নজরুল চরিত মানস, পৃঃ ৭২।

(৯) Civil List 1960 : Government of East Pakistan.

(১০) আলহাজ্ব খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ ঃ জীবনস্মৃতি, পৃঃ ১২২-২৩।

(১১) ঐ, পৃঃ ১৪০।

(১২) বিরজাসুন্দরী দেবী ঃ 'নৌকাপথে'—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৯।

(১৩) নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড) ঃ ছায়ানট, পৃঃ ১৬৫-২১৯।

(১৪) ১৩২৮ সাল ২৫শে জ্যৈষ্ঠের লেখা চিঠি ঃ নজরুল চরিত মানসে উদ্ধৃত, পৃঃ ৭৯।

আবদুল মওদুদ

এই সঙ্গে পড়ুন

সাহিত্য পত্রিকা

বর্ষা ও শীত সংখ্যা ১৩৬৪ ও ১৩৬৫। প্রতি সংখ্যা ২·০০
বর্ষা ও শীত সংখ্যা ১৩৬৬ থেকে ১৩৭৪। প্রতি সংখ্যা ২·৫০

অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহ্‌সান

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। ১০·০০
[পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, ঢাকা]

অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত

ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ, ১৩৭০। ২·৫০

ডক্টর আহমদ শরীফ সম্পাদিত

পুথি পরিচিতি। ২০·০০
আলাউল বিরচিত 'তোহফা'। ২·৫০
মুহম্মদ খান-বিরচিত 'সতকলি বিবাদ-সংবাদ'। ২·৫০
মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য। ২·৫০
জয়েনউদ্দিন-বিরচিত 'রসুল বিজয়'। ২·৫০

অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই

ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব। ১২·০০

ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক। ১০·০০

অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

আধুনিক কাহিনী-কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র। ২·৫০

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী

ড্রাইডেন ও ডি· এল· রায়। ২·৫০
সরোজিনী ও ইফিজেনিয়া। ২·৫০

ডক্টর হরেন্দ্র চন্দ্র পাল

বাংলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ সংকলন। ১০·০০

লেখক-পরিচিতি

মযহারুল ইসলাম, এম. এ. (ঢাকা), পি-এইচ. ডি. (রাজশাহী ও ইণ্ডিয়ানা),
অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কাজী আবদুল মান্নান, এম. এ. (ঢাকা), পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন),
রীডার, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আবদুল নইম, এম. এ. (কলিকাতা),
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, দৌলতপুর কলেজ, খুলনা

সাইয়েদ আবদুল হাই, এম. এ. (ঢাকা)
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া, এম. এ. (কলিকাতা),
অধ্যাপক, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ আবু জাফর, এম. এ. (ঢাকা),
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আবদুল মওদুদ, এম. এ., বি. এল. (কলিকাতা),
অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, ঢাকা হাইকোর্ট

A PHONETIC AND PHONOLOGICAL STUDY OF

Nasals and Nasalization in Bengali

by MUHAMMAD ABDUL HAI

Rs. 15/-

"...fresh and full of interest to all students of Linguistics."

—J. R Firth,

Late Emeritus Professor of Linguistics, University of London

"...an outstanding contribution by an Indo-Pakistan scholar on one of the major languages of the sub-continent..."

—Suniti Kumar Chatterji,

National Professor of India

"The Science of Phonetics had its brilliant beginning in ancient India ; and in recent times its influence has merged with the development of western linguistics to the benefit of both streams of scholarship. It is, therefore, particularly gratifying when the current techniques are applied by scholars from the Indo-Pakistan sub-continent to their modern languages.

Mr. Hai's book...is an excellent exemplification of such work."

—W. S. Allen,

Professor, Comparative Philology,

University of Cambridge

The Sound Structures of English and Bengali

by M. A HAI & W. J. BALI

Rs. 8/-

In this book, the first of its kind in Pakistan, the authors have analysed and compared the sounds of English and Bengali. An invaluable work for those who want to improve their spoken English.

Traditional Culture in East Pakistan

by Dr. M. SHAHIDULLAH & Prof. M. A. HAI

Rs. 7·50

A survey under UNESCO project. Historical analysis and descriptive narrations and photographs. Highly appreciated by Prof. Suniti Kumar Chatterji, National Professor of India; Prof. M. Barash, UNESCO adviser, Techical Assistance Mission (Social Science) and others.

The Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal

(Upto 1855 A. D.)

by Dr. QAZI ABDUL MANNAN,

Reader in Bengali, University of Rajshahi.

Rs. 8·00

"Dr. Mannan brought to his researches not only a thorough and unremitting industry and a critical acumen but also a capacity for objective and impartial assessment. It is often difficult to resist partisan pressure, with all that they mean by way of special pleading; but if literary studies are to be of abiding value they must be guided by literary criteria only and rigidly avoid conclusions based on other factors. It was his ability to weigh issues justly that was to me the most gratifying feature of Dr. Mannan's approach to his subject."

—T. W. Clark,
University of London.

Published by the Department of Bengali, Dacca University

SAHITYA PATRIKA
Journal of the Department of Bengali
University of Dacca
Vol XI, No. 1 : Rains, 1968